দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১২শবর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৭খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

*

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার
মিঃ সন্তোষ মণ্ডল

*

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

*

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার্তার এই সংখ্যাটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অতীত, বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নানা অবদান সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানকে আরও নিবিড় করতে সাহায্য করবে।

আদিবাসীরা হচ্ছে এ উপমহাদেশের আদিম জনগোষ্ঠী। তাই তাদেরকে দেশের প্রথম বাসিন্দা ও নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের সকলেরই উচিত। তাছাড়া, আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য সামাজিক কর্মপন্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক শাসনের দমনমূলক ও নীতিবিরুদ্ধ নীতিমালার আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। দরকার বিগত দিনগুলোতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর যে সকল অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ ও উপায় বের করা।

আদিবাসী সংস্কৃতির সুমহান মূল্যবোধ, তাদের সামাজিক কাঠামোয় সমতাবাদ, তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, ঋতুভিত্তিক ও সামাজিক নাচগানে গণমুখী শিক্ষা আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয়। তাদের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলো হল, যিনি সর্বাতীত তাঁর সর্বোপরি ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান, প্রবীণদের সম্মান, লিঙ্গ-সমতা, সামাজিকতা, আতিথেয়তা, সংহতি ও সহভাগিতার মনোভাব, সমাজবোধ এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এ সকল মূল্যবোধের সঙ্গে আরও যোগ করা যায় অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহৃদয়তা, মৌলিক সততা, কঠোর শ্রম, সৃজনশীলতা, সাদাসিধা জীবনযাপনে খুশি ও আনন্দ, প্রকৃতি প্রেম এবং ভূমি ও জমির প্রতি বিশেষ টান, স্বাধীনতা প্রেম, পিতামাতার শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন, বিভিন্ন পালা-পার্বণের মাধ্যমে জীবনকে উদ্‌যাপন আর ভবিষ্যৎ আশার কথা। এ সকল মূল্যবোধ আমাদের দান করবে এক নতুন ধরনের নতুন আদর্শ নমুনা।

মণ্ডলীর কাজ হল, আদিবাসী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সুন্দরকে সংরক্ষণ ও প্রসারণে সহায়তা দান, তাদেরকে অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অবিচার হতে মুক্ত হতে পূর্ণ সমর্থন প্রদান, মানসম্পন্ন শিক্ষাদান, তাদেরকে আধুনিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সহযাত্রা।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে গৌরবজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাস। উন্নয়নের ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বঞ্চিত আদিবাসীগণকেই সচেতন হয়ে উঠতে হবে। তাদের পরিচয় অন্বেষণ ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আদিবাসীদের সংগ্রাম করে যেতে হবে, মানবীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণে অব্যাহত রাখতে হবে তাদের আন্দোলনগুলো। সরকারী, বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান এবং মণ্ডলী আদিবাসী উন্নয়নে ও তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করতে পারে।

আদিবাসী অধিকার ও সংস্কৃতির প্রসারণ

-*John Desrochers*

আদিবাসী হই বা না হই, আদিবাসী এলাকায় বাস করি বা না করি, আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের সকলের জন্য এই সহায়িকার প্রাসঙ্গিকতা কী ? লেখক ও প্রকাশকগণ এটা সারা দেশ জুড়ে অধ্যয়ন থেকে যে অর্জনটি আশা করেন তা কী ?

এ সহায়িকার প্রাসঙ্গিকতা

আমরা জানি, আদিবাসী অধিকার ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা সমর্থন আমাদের সকলকেই নানা দিক দিয়ে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। নিবিড়ভাবে পাঠ করলে, এই সংখ্যাটি সর্বপ্রথমত আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলবে যে, ইতিহাস জুড়ে আদিবাসীরা কতই না শোষিত-নিপীড়িত হয়েছে আর আজও (হয়তবা পূর্বের থেকে অনেক বেশী হারে) হচ্ছে। এই সহায়িকাটি সর্বোপরি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানব বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অতীত, বর্তমান আর সম্ভাবনাময় নানা অবদান সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানকে আরও নিবিড় করতে সাহায্য করবে। এছাড়া এটা তাদের একান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোও ভালমত বুঝতে সাহায্য করবে, যেগুলো অনেক সময় তাদের সংগ্রাম, আন্দোলন, এমনকি বিদ্রোহে প্রকাশ পেয়েছে। এ সবই তাদের মূল্যবোধ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তাদের সংস্কৃতির প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও প্রশংসার মনোভাব পোষণে আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে।

এই সহায়িকাটি পরিশেষে আদিবাসী সংস্কৃতির অর্থবহ সংরক্ষণ, সমর্থন ও রূপান্তরে নিজেদের দায়িত্বকর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সকলকে বিবেকী করে তুলবে। এটা আমাদের আরও বিবেকী করবে যেন আমরা আমাদের নাগরিক ভাইবোনদের আদিবাসী ভাবনা ও সমস্যা, বিষয় ও অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল ক'রে তুলি, এমনকি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে এর নীতিমালা ও ক্রিয়াকলাপে অনেক বেশী আন্তরিক হয়ে উঠতে উদাত্ত আহ্বান জানাই। এগুলো সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, আর একটি বিশাল নৈতিক বাধ্যবাধকতাও। (আমরা কি ভেবে দেখেছি যে, আদিবাসীরা হচ্ছে ভারতীয় সংখ্যার প্রায় ৮ ভাগ, মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং খ্রীষ্টান ও শিখদের থেকে ৩.৪ থেকে ৪ গুণ বেশী।) পালনের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; এই দাবি আরও জোরালো হয় যদি আমরা নিজেরা আদিবাসী অথবা আদিবাসী জনপদে আমাদের বসবাস। এ থেকে আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী এবং গোটা সমাজ ভীষণ উপকৃত হবে !

বিশেষ করে বিগত কয়েকটি দশক ধরে, সংঘ পরিবার ইতিহাসে হিন্দুদের প্রতি যে সকল অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় উত্থাপন করে এসেছে। সংঘ পরিবারের উত্থাপিত বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, এ কথা আমাদের অকপটে স্বীকার ও ঘোষণা করতে হয় যে,

আদিবাসী (ও দলিত) জনগোষ্ঠীরও একইরূপ বিষয় উত্থাপনের অনেক বেশী অধিকার আছে ! এই অন্যতম চেতনাই আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনকদের সংবিধানে তাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তথাপি, আদিবাসীদের প্রতি ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক নানা অন্যায়ের প্রতিবিধান করার প্রয়োজনীয়তা ও তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নৈতিক দায়িত্ব এবং তাদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ আজকে জাতীয় চেতনা ও বিবেকে খুব কমই জায়গা করে নিতে পেরেছে। তাদের পরিচয় রক্ষায়, তাদের সংস্কৃতির সমর্থনে এবং তাদের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো তাদের অধিকার সংরক্ষণের ও তাদের চাহিদা পূরণের যে ব্যাপক তাগিদ তার সঙ্গে তুলনায় খুবই নগণ্য। বাস্তবিকপক্ষে, এমন কথা বলা যেতে পারে যে, স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের অধিকার ব্যাপকহারে লঙ্ঘিত হওয়া অব্যাহত রয়েছে।

আদিবাসী সংস্কৃতির ‘পুনঃসৃষ্টি’

সম্পাদক হিসেবে, এই সহায়িকার প্রতিটি পৃষ্ঠা আমি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছি। এইভাবে, এ বিষয়টি আমি অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, প্রায় সবগুলি অধ্যায় আজকে আধুনিকায়ন, জাতীয় উন্নয়ন, বিশ্বায়ন, হিন্দুত্ববাদ এবং তাদের জনপদ ও সাংস্কৃতিক জগতের অতীত ও চলমান আক্রমণের কারণে আদিবাসীরা যে ভয়ানক টানাপোড়েনের মুখোমুখি তার উপর আলোকপাত করেছে। তাদের জীবিকা (ভূমি, বন, অন্যান্য সম্পদ ও কর্মসংস্থান সুযোগ), তাদের সংস্কৃতি, এমনকি তাদের পরিচয়ের উপর আক্রমণ এত প্রবল যে, আদিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয় ‘আত্মরক্ষামূলক’ পন্থা গ্রহণের, তাদের অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষা করার এবং বিভিন্ন ধরনের ‘পুন:জাগরণ আন্দোলনের’ বিস্তার ঘটানোর উপর নিজেদের মনোনিবেশ ঘটাতে। এই প্রক্রিয়ায় যে ঝুঁকিটি জড়িত তা হল, ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করার, নানা বিকল্প খুঁজে বের করার, এবং আজকের ও আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আদিবাসীরা কিভাবে তাদের সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা অবধারণ করার প্রয়োজনীয়তাকে কিছুটা খাটো করা। এই সহায়িকায় বেশ কতকগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রস্তাব করা হলেও, প্রয়োজন এগুলোর উপর জোর দেওয়া ও গড়ে তোলা।

আশা করি আমার এই অকপট দৃষ্টিভঙ্গি সহভাগিতায় আদিবাসী বন্ধুরা ক্ষুণ্ন হবেন না। আমার ভুল হলেও হতে পারে, তবে আমি নিশ্চিত জানি যে, আজকে আদিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে,

তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জগতে ঘটে চলা গভীর ও অনিবার্য পরিবর্তনগুলোর অসীম সাহসের সাথে মুখোমুখি হওয়া, আর এইভাবে তাদের সংস্কৃতি, এমনকি তাদের পরিচয় সৃজনশীলতার সাথে ও নির্ভীকচিত্তে 'পুনর্গঠন', 'পুনরাবিষ্কার' এবং 'পুনঃসৃষ্টি' করা। এ প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে যখন সকল প্রাসঙ্গিক প্রচেষ্টার সঙ্গে এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, সংগঠন ও ভাবাদর্শের সঙ্গে একটি চলমান সংলাপ ও আন্তরিক সহযোগিতা ঘটবে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, করার থেকে বলা অনেক সহজ, তবে আদিবাসী তথা দেশের ভবিষ্যৎ জরুরিভিত্তিতে এমন কাজই প্রত্যাশা করে আর এরই উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। পারতপক্ষে, আদিবাসী ও স্থানীয় জনগণের এক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখার আছে।

সংলাপ ও সংহতি

আশা করা যায়, এই সহায়িকাটি, আজকে আমাদের দেশ যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলোর উপর অনেকের চিন্তাভাবনা ও সংলাপকে গভীর ও ধারালো করবে। কাজেই প্রস্তাব হল, এই সহায়িকায় উত্থাপিত প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে নিজ সমাজের কোন একটি দলের সঙ্গে (যেমন সামাজিক এ্যাকশন/আন্দোলন দল, জনসংগঠন, নিজেরা করি দল, মৌলিক বা সক্রিয় মানব/খ্রীষ্টীয় সমাজ ইত্যাদি) অথবা এই লক্ষ্যে বিশেষভাবে গঠিত একটি দলের সঙ্গে আলোচনায় বসা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের প্রতি আহ্বান হল যেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা, ভাবনাচিন্তা ও সম্পৃক্ততা এ সকল দলে সহভাগিতা করেন। এ ধরনের সংলাপ বা সহভাগিতা বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন ভাবনাচিন্তাকে এগিয়ে নেবে এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিকল্পসমূহ খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এ সংলাপ বা সহভাগিতা আমাদের দেশের সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি আরও ভালভাবে সাড়া দিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই সহায়িকাটি কার্যধর্মী বিধায়, আশা করা যায়, এই সহায়িকাটি অনেক পাঠক-পাঠিকা ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের সাহায্য করবে তাদের আন্দোলন দলগুলো নিয়ে পুনঃচিন্তাভাবনা করতে এবং এগুলোকে বাস্তবরূপ দান করতে। এক্ষেত্রে আমাদের সবারই অনেক কিছুই করার আছে। তাই শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বাক্সটি অনুসরণের এবং দলের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করা যাচ্ছে। এটা বাস্তবায়িত করুন। আপামর আদিবাসী

জনগোষ্ঠী আপনার অমূল্য অবদানের জন্য পথ চেয়ে আছে।

পবিত্র ক্রুশ আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা দপ্তরের সংহতি পত্রে সংহতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "সংহতি বলতে বুঝায় মানব একতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রতি নৈতিক সাড়াদান। পোপ দ্বিতীয় জন পল যেমনটি বলেছেন, সংহতি বলতে বুঝায় না কাছের বা দূরের অনেক মানুষের দুর্ভাগ্যে ভাসাভাসা দরদ কিংবা লোক-দেখানো কষ্টবোধ। কিন্তু এটা হল, নিজেকে সাধারণ মঙ্গলের তরে সঁপে দেওয়ার দৃঢ় ও অবিচল সঙ্কল্পবোধ; আরেক কথায় সকলের ও প্রত্যেকের মঙ্গলের তরে, কেননা আমরা সবাই সবার জন্য দায়িত্বশীল" (SRS, 38)। সংহতি মানব একত্বকে বাস্তবতা দান করে। একটি বিশ্বজনীন সংহতির সংস্কৃতি – অর্থাৎ নতুন নতুন সামাজিক নীতিমালা, ব্যবস্থা, ও কাঠামো যেগুলো সকলের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য সংহতির অঙ্গীকারকে মূর্ততা দান করে – গড়ে তোলাই হল প্রান্তীয় অবস্থার সর্বশেষ প্রতিষেধক ঔষুধ এবং মানবাধিকারের সুনিশ্চিত নিশ্চয়াক।" সুতরাং, আমরা যে যেভাবে পারি, আমরা যেন আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা, সংহতি প্রকাশ করি।

১

ভারতীয় আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী

জন বি. মুন্ডু

দু'টি পদ্ধতি ভারতীয় আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীকে বুঝতে সাহায্য করে : (১) নিজেদের সম্বন্ধে আদিবাসীদের জ্ঞান; (২) আদিবাসীদের সম্বন্ধে অভিজাত শাসক শ্রেণীর জ্ঞান। দ্বিতীয় পদ্ধতিকে নেতৃত্ব দান করেন দেশের পরিচালকগণ এবং নৃতত্ত্ববিদ/সমাজবিদগণ; এ নেতৃত্ব প্রদানকারীগণ হচ্ছেন উচ্চবর্ণের ও উচ্চশ্রেণীর। বাস্তবে ভারতীয় আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীকে ঘিরে জ্ঞানের উভয় পদ্ধতি দু'টি পরস্পর বিরোধী।

অভিজাত শাসক শ্রেণীর আদিবাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞান

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবিধান রচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লে, মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন ব্যক্তি আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছিল। শাসক শ্রেণীকে দেশের সকল স্থানে ছড়িয়ে থাকা এ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের মুখোমুখি করা হয়েছিল। আদিবাসী বিষয়টির সমাধানে তিন প্রধান ধারণার প্রস্তাব করা হয় (বিচ্ছিন্নতা, অভিযোজন, এবং অন্তর্ভুক্তকরণ)। এক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন পরিষদ তৃতীয় ধারণাটিই গ্রহণ করে। এ মোতাবেক, দু'টি সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথম, দেশব্যাপী আদিবাসীদের একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে তা সংসদকে দেওয়া হয় মাঝে-মাঝে তফসিলি উপজাতিদের (Scheduled Tribes) তালিকা সরকারিভাবে নির্ধারণ করার জন্য। দ্বিতীয়, তফসিলি অঞ্চল ও তফসিলি উপজাতিদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আইনের বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি ক'রে সেগুলোকে সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পঞ্চম তফসিলে ঘোষণা ও নির্দেশ করে বলা হয়েছে পারতপক্ষে একজন 'আদিবাসী' কে ? এবং ষষ্ঠ তফসিলে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে আদিবাসীদের রক্ষা করার কথা। এ তফসিল দু'টির মধ্য দিয়ে মূলত: উচ্চ বর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীর অভিযোজনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, আর আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিয়মনীতি ও আইন। একটি বিড়ম্বনা হল, একজন সে যে রাজ্যের তালিকাভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য, তার সদস্য পদ শুধুমাত্র সে রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যান্য রাজ্যে নয়। এর মধ্য দিয়ে আদিবাসী হিসেবে তার ব্যক্তি পরিচয়কে ও তার সমাজকে অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু, নিজেকে আদিবাসী বলে প্রমাণে একজনকে সরকারি সার্টিফিকেটও দাখিল করতে হয়। আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীদের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণাকে সংবিধানে 'একবার চিরকালের মত' নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এরপর, এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে যা-খুশি করার দায়িত্ব সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের ধারণাটির বৈশিষ্ট্য মূলত আইনগত ও নিরাপত্তামূলক, তবে এ ধারণা শাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আদিম জনগোষ্ঠীর এবং সবধরনের শ্রেণী-গোষ্ঠীর বিপক্ষে এ জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ইতিহাস নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা দাবি করার তাদের দৃঢ়সংকল্পের পক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে। 'তফসিলি উপজাতি : ভারতীয় জনগণ' শীর্ষক কে.এস সিংহের অমূল্য রচনাকর্মে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ভারতে আদিবাসী বিষয়ক সব ধরনের

আলোচনা এ ধারণা থেকে শুরু হতে হবে যে, একজন আদিবাসী হচ্ছে ভারতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ধারণা" (১৯৯৭ : ১৩)। এই অমূল্য রচনাকর্মটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৬১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি সার্বিক পরিচয় প্রদান করে।

ভারতে এ সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দটি হচ্ছে উপজাতি, আদিবাসী। হিন্দিভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের একাংশ 'গিরিজান' (পাহাড়ি জাতি) অথবা 'বনবাসী' শব্দ ব্যবহার করেন। এদের সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে ইংরেজীতে Scheduled Tribes ('তফসিলি উপজাতি') এবং হিন্দিতে অনুশুচিত জনজাতি (anusuchit janjati)।

আদিবাসীদের নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞান

নিজেদের সম্পর্কে আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর ধারণা কী ? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য টানা। এ দু'টি দিক পারস্পরিক দিক দিয়ে একচেটিয়া নয়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দিক বেশী গুরুত্ব পায় যখন অন্যটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে গ্রহণ করা ঠিক নয়, কেননা দু'টির প্রতিটি ভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের। পৌরাণিক জ্ঞান এটার উপর আলোকপাত করে যে, ইতিহাসের বাইরে একটি বাস্তবতা বিদ্যমান, যখন ঐতিহাসিক জ্ঞান বাস্তবতার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করে তখন এটা নিজেকে ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীগুলো বাস্তবতা সংক্রান্ত তাদের জ্ঞানে পৌরাণিক জ্ঞানের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করেন। সুতরাং, নিজেদেরকে তারা বোঝেন প্রধানত যে সকল জীবের মাঝে নিজেদের তারা খুঁজে পায় তাদের সঙ্গে তাদের প্রতিতুলনার প্রেক্ষাপটে। এ সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ এমন এমন শব্দ ব্যবহার করেন যেগুলোর মূলত "মানুষ"কেই বুঝানো হয় (নারীজাতি ও পুরুষজাতি উভয়কে বুঝাতে)। উদাহরণস্বরূপ, মিকিররা Arleng, গারোরা Mande, বরোরা Kacharias, কয়েনরা Singpho, মুন্ডারা Horo (একবচন) ও Horoko (বহুবচন), সাওতালরা Hor, হোসরা Ho শব্দ ব্যবহার করেন। সকল দৃষ্টান্তে, ব্যবহৃত শব্দটি মানুষ নয় এমন জীবের সঙ্গে পার্থক্য বুঝাতে মানুষ অর্থকেই নির্দেশ করে। কিন্তু তাদের সহ-মানুষরা যারা আদিবাসী নয় তাদের সঙ্গে তুলনায়, তারা নিজেদের Adivasis বলেই অভিহিত করেন।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সচেতন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা তাদের দেশে হানা দিয়েছিল তাদের সঙ্গে তুলনা করতে ব্যবহার করা হয় সংস্কৃত শব্দ Adivasi (Adi = প্রথম, আদিম, মূল, vasi = বসবাসকারী, বাসিন্দা; সুতরাং আক্ষরিক অর্থে যার অর্থ হল, প্রথম বা আদিম বাসিন্দা)। আদিবাসী কথাটি সারা ভারতে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই নাম ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেই নির্দেশ করে। আদিবাসী হিসেবে এই আত্ম-পরিচয় আদিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আধুনিক ধারণার সঙ্গে খাপ খায়। তাই তো আদিম জনগোষ্ঠী বিষয়ক আন্তর্জাতিক শ্রম দল IWGIA বলে : আদিবাসী হিসেবে, 'আমরা হলাম স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ধারী মানুষ। পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের ইতিহাসের জন্য, আমাদের ভাষা, আইন-কানুনের জন্য এবং আমাদের ভূমি ও জনপদের সঙ্গে বিশেষ আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য আমরা একতাবদ্ধ' (IWGIA 2000 : 395)।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এত সব জোরালো দাবি বা ঘোষণা সত্ত্বেও, ভারত সরকার দেশে আদিম জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি স্বীকার করে না; সরকার পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়, বিভিন্ন মাত্রায় সকল আদিবাসীকে বিস্তৃত সমাজে একীভূত করে নেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনে (১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ওয়ার্কিং গ্রুপ) ভারতীয় প্রতিনিধির নীবরতা আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারত সরকারের দ্বিমুখি অবস্থানের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে, 'ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় শাসক শ্রেণী একটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে 'অন্তর্ভুক্তকরণ' প্রক্রিয়ার আড়ালে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে 'প্রধান স্রোতধারায়' একীভূত করার চেষ্টা করেছে।'

অন্তর্ভুক্তকরণকে মূলত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ দেশ শাসন করছে সেই সমাজে অঙ্গীভূতকরণ হিসেবে বুঝা হয়।

আাদিবাসী বা 'তফসিলি উপজাতিরা' দেশের আদি বাসিন্দা বা আদিম জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের রক্ষায় যেমন পারদর্শী ছিলেন না, তেমনি বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখে তাদের ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেমন পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা দ্রাবিড়, ইন্দো-আর্য ও মঙ্গোলীয়রা, যারা শুধুমাত্র জনবল শক্তির দিক দিয়েই এগিয়ে ছিল না, পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত ছিল। আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী নানা কাহিনী থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই অবাসযোগ্য গভীর বনাঞ্চল কেটে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিলেন।

মুণ্ডা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে হপম্যান লিখেছেন, যা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, 'যতদূর পর্যন্ত সুদূর অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকানো যায়, আমরা মুণ্ডাদের বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াইয়ের জীবনচিত্র দেখতে পাই, যে লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল বাঘের গ্রাস ও সাপের কবল থেকে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম ছিনিয়ে নেওয়া। যখন তারা এইভাবে (প্রস্তুত) বড় বড় জনপদের মালিক, সেই সময় হানাদারদের দল, একের পর এক, হানা দিয়ে তাদের বাধ্য করেছে তাদের সম্পদ পরিত্যাগ করতে, দাসের ন্যায় জমিতে কাজ করতে, অথবা এ সম্পদের রক্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিতে। তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত একটি দুর্বল ও অনগ্রসর জাতি, বেঁচে থাকার অযোগ্য বলে, কারণ তারা পছন্দ করত তাদের শ্রমের ফসল তাদের আগ্রাসীদের হাতে তুলে দিয়ে বনের আরও অনেক পশুর কাছ থেকে আরও অনেক নতুন নতুন ভূমি ছিনিয়ে নিতে, যে বনগুলোর অবস্থান বলিষ্ঠ আক্রমণকারী জাতির 'সভ্যতা' থেকে বহু দূরে, আর এমনটি চলে এসেছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, যখন ভারতের অভ্যন্তরস্থ অবশিষ্ট কয়েকটি বন তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়' (হপম্যান ১৯৩০:৪৬১)। হপম্যানের উপরোক্ত কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভূমির সঙ্গে তাদের আদি সম্পর্কের কারণে, আদিবাসী শব্দটি আদিবাসী আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে সঠিকভাবে খাপ খায়।

আদিম জনগোষ্ঠীর ভৌগলিক বণ্টন

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বিষয়ক আন্তর্জাতিক শ্রম দল IWGIA পৃথিবীর সকল মহাদেশের সর্বত্র আদিবাসী ও অনাদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থানের উপর আলোকপাত করেছে : উত্তর মেরু ১০০,০০, উত্তর আমেরিকা ১.৫ মিলিয়ন, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা ১৩ মিলিয়ন, স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্যভূমির অধিবাসী ১৭.৫ মিলিয়ন, স্কটল্যাণ্ডের নিম্নভূমির অধিবাসী ১ মিলিয়ন, পশ্চিম আফ্রিকার বেদুইন ৮ মিলিয়ন, পূর্ব আফ্রিকার বেদুইন ৬ মিলিয়ন, পিগমী ২৫০.০০০, সান এণ্ড বাসারবা ১০০,০০০, প্যাসিফিক ১.৫ মিলিয়ন, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ২৫০,০০০, মৌরি ৩৫০,০০০, সামি ৮০.০০০, রাশিয়া ১ মিলিয়ন, পশ্চিম এশিয়া ৭ মিলিয়ন, দক্ষিণ এশিয়া ৫১ মিলিয়ন, পূর্ব এশিয়া ৬৭ মিলিয়ন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৩০ মিলিয়ন (IWGIA 2000:4-5)। অন্যান্য পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, ৩০০ মিলিয়নের বেশী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ৭০টির বেশী দেশে বসবাস। শুধুমাত্র ভারতেই ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে এদের সংখ্যা ছিল ৬৭,৭৫৮,৩৮০, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭.৯৫ ভাগ (১৯৯১ আদমশুমারী)। সেই সময় মোট জনসংখ্যার ২৫.৭ ভাগের মধ্যে মাত্র ৯.৯৫ ভাগ তফসিলি উপজাতির বসবাস ছিল শহরাঞ্চলে। তফসিলি উপজাতিরা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা বাদে ভারতের সকল রাজ্যে, চণ্ডিগড়, দিল্লি, পণ্ডিচেরী বাদে – কেননা এগুলোতে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে তফসিলি উপজাতিদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি – ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলগুলোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, (নন্দ ১৯৯৩:৬)।

ভারতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মূলত দেশের বনাঞ্চল ও পাহাড়ি জনপদে বসবাস। সরকারি হিসেবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৬৩৫টি (সিং ১৯৯২:২১০),

অ-তালিকাভুক্ত আদিবাসীদের আরও অনেক দলের অবস্থান বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে, আর তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ। বিভিন্নতা সত্ত্বেও, আদিবাসীরা পৌরাণিকের দিক থেকে একতাবদ্ধ। যে দিকটি তাদেরকে সারা দেশে একতাবদ্ধ করে, তা হল বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের দর্শন। অন্য কথায়, বাস্তবতার প্রতি তারা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করে : প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষ এ তিনটি দিককে প্রতিটি বাস্তবতার উপাদান হিসেবে বুঝা হয়। এই দর্শন তাদের বিভিন্ন পৌরাণিকে (মানুষ, অন্যান্য জীব এবং উৎপত্তি সম্পর্কিত কাহিনী) সন্নিবেশিত। দৈনন্দিন জীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা এই দর্শন অনুসরণও করেন।

আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী ভারতের যে সকল অঞ্চলে বসবাস করে সেগুলো হল, সাতপুরা পর্বতের সমগ্র পূর্ব অংশ, পূর্ব গুজরাট, সাব-হিমালয় অঞ্চলসমূহ, মধ্য মালভূমি, বিন্দিয়া পর্বত, কৃষ্ণ নদের দক্ষিণে পশ্চিম ঘাট এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, ইত্যাদি। সুতরাং, ভারতে আদিবাসী জনসংখ্যাকে চার পৃথক ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল; (২) মধ্য অঞ্চল; (৩) দক্ষিণ অঞ্চল; এবং (৪) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

১। যে সকল অঞ্চল নিয়ে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব আদিবাসী অঞ্চল গঠিত সেগুলো হল : সাব-হিমালয় অঞ্চলসমূহ, উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বতমালা, তিস্তা ভ্যালি এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর যমুনা-পদ্মার মধ্যবর্তী স্থলভাগ। এ অঞ্চলের আওতাভুক্ত রাজ্যগুলো হল আসাম, অরুনাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর ও ত্রিপুরা। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই সাতটি রাজ্য হচ্ছে ১৮২টি সম্প্রদায়ের বাসভূমি। শুধুমাত্র অরুনাচল প্রদেশেই আছে ৬২টির মত সম্প্রদায়। উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলগুলো হচ্ছে নাগা আদিবাসীদের বাসভূমি। অরুনাচল প্রদেশে প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে আকা, আবর, মিরি এবং ডাফলা (Akas, Abors Miri Daflas)। মনিপুর ও মেঘালয়ে কুকি চিন, লুশাই, লাখের, গারো এবং খাসিয়া (Kuki Chins, Lushais, Lakhers, Garos and Khasis) হচ্ছে প্রধান সম্প্রদায়। দেশের আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ১৩ ভাগের বসবাস এই অঞ্চলে।

২। মধ্য অঞ্চলকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে আলাদা করে রেখেছে গারো ও রাজমহল পর্বত। বিভিন্ন পর্বত ও মালভূমি – উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি – নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, দক্ষিণ উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা। এই অঞ্চলে তফসিলি উপজাতিদের সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

মধ্য অঞ্চলে ২৪৪টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। উড়িষ্যায় সাভার, গাদাবা, খোন্দ, কোরবা, জুয়াং এবং ভুইয়াং (Savar, Gadaba, Khond, Korwa, Juang, Bhuian) আদিবাসীদের এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। সাতপুরা ও মাইকল পর্বতমালায় করকু, আগারিয়া, প্রধান এবং বাইগা (Korku, Agaria, Pradhan, Baiga) আদিবাসীদের বসবাস। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলায় মুরিয়া, আবুঝমার, হিল মুরিয়া, কয়া (Muria, Abujhmar, Hill Muriya, Koya) এবং অন্যান্য আদিবাসীদের দেখা যায়। অন্ধপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ গন্দ (Gond) আদিবাসীতে ভরপুর। তাই, উপদ্বীপ ভারত গন্দওয়ানা (Gondwana দেশ নামেও পরিচিত। রাজস্থানে আছে ভিল, গারাসিয়া, সোহরিয়া, রাওয়াৎ এবং মিনা (Bhil, Garasia, Sohria, Rawat, Mina) আদিবাসী সম্প্রদায়। গুজরাটে ধোদিয়া, ভিল, দাফার, পাতিলিয়া, দুবলা এবং কলি সম্প্রদায় (Dhodias, Bhils, Daffars, Patelias, Dublas, Kolis) হচ্ছে, প্রধান প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী। মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ এই অঞ্চলে বসবাস ক'রে।

৩। দক্ষিণ আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে পড়ে কর্ণাটক রাজ্য, দক্ষিণ অন্ধপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, কেরালা এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের জেলাগুলো। এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হচ্ছে ছেনচু, কটা, পানিয়া, টোডা, কাদার, উরালি, বাদগা, ইরুলা, মুথুবান এবং কুরুম্বা মালাপান্দারাম, রেড্ডি ও কয়া (Chenchus, Kotas, Paniyas, Todas, Kadars, Uralis, Badgas, Irullas, Muthuwan, Kurumba Malapnadarams, Reddis, Koyas)। এ অঞ্চলের

বিস্তৃতি ওয়েআনন্দ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

৪। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে অংগা, জারাবা, সেনটিলি, আন্দামানি এবং নিকোবারি (Onga, Jarawa, Sentili, Andamani, Nicobari) আদিবাসীদের বাসভূমি।

বর্তমান আদিবাসী অবস্থানগুলোর উৎস

আদিবাসীরা তাদের নিজ নিজ বর্তমান অবস্থানগুলোয় কিভাবে বসতি শুরু করেছিল ? – এ সংক্রান্ত প্রশ্নটি যেমন জটিল তেমনি হতবুদ্ধিকর। এখানে উদ্দেশ্য, বোধগম্য বা যুক্তিযুক্ত কোন তত্ত্ব প্রদান করা নয়, কিন্তু বিগত শতকগুলোতে প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাযাবর জীবন ঐতিহ্যের সত্যতাই নির্দেশ করা, যে যাযাবর জীবনের লক্ষ্য ছিল নিজেদের জন্য একটি দেশের অধিকারী হওয়া এবং একটি জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় সংরক্ষণ করা। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আদিবাসীদের ইতিহাস তাদের মুখে মুখে চলে আসা ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত। এ সকল ঐতিহ্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের নিজেদের কাহিনী। এ সকল ঐতিহ্যকর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দু শাস্ত্র থেকে এবং রাজবংশের ইতিহাস থেকে আদিবাসীদের ইতিহাসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টাগুলো শাসক এবং আক্রমণকারী গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা। আজকের দিন পর্যন্ত – অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের মধ্যে তাদের আত্মভূত করেছে – আদিবাসীরা কিভাবে এ সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণী থেকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে তা আমরা জানি, যে পরিচয় তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা ব্যবস্থায়, বিশ্বাসে, আচার-অনুষ্ঠানে ও সম্পর্কে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে, তাদের মৌখিক ঐতিহ্যে আদিবাসী অতীতকে সপ্রাণ রাখা হয়েছে।

মৌখিক ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাস যা তাদের পারিবারিক বৃক্ষ (কুর্শিনামা), উক্তি, গান এবং সমাধিভূমিতে সংরক্ষিত। এ সকল মৌখিক ঐতিহ্য দু'টি বিষয় প্রকাশ করে : (১) পরে আসা মানুষ কিভাবে আদিবাসীদের বাসভূমি থেকে আদিবাসীদের বিতাড়িত করেছে, পরে আসা এ সকল মানুষ ছিল ধূর্ততায় ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠ; (২) তাদের পরিচয় ও তাদের বাসভূমি ধরে রাখার লক্ষ্যে আদিবাসীরা বৈশিষ্ট্যে কতই না লড়াকু ছিল। নীচের সাঁওতাল গানের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদটি এরই পক্ষে সাক্ষ্য দেয় :

শুধু একমুঠো অন্নের জন্য,
শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য
আমি এগ্রাম-সেগ্রাম ঘোরাঘুরি করেছি,
বেড়িয়েছি বারোটি (অর্থাৎ বহুসংখ্যক) দেশ।

অভিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস

অভিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস বলতে বুঝায় বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য যা আদিবাসীরা আজও হস্তান্তর করে আসছে, তবে এখন এ হস্তান্তরের ঘটনা ঘটছে লিখিত আকারে। এখানে নীচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে মধ্য অঞ্চলের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

আদিবাসী মুণ্ডাদের রয়েছে অনেক ঐতিহ্য, এ সকল ঐতিহ্য তাদেরকে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশ ঘুরে বেড়ানো একটি জাতি হিসেবে তুলে ধরে। আর্যদের আক্রমণের পর, মুণ্ডারা আজিমগড় চলে এসে সেখানে

বসতি স্থাপন করে বলে মনে হয়। সেখান থেকে তারা অভিবাসিত হয় (বরং বলা যায় বহিষ্কৃত হয়) এ সকল জায়গায় : কালাঞ্জার, গড় চিত্রা, গড় নগরবার, গড় দরবার, গড় পালি, গড় পিপড়া, মান্দার পাহাড়, বিজনগড়, হর্দিনগড়, লক্ষ্ণৌগড়, নন্দনগড়, রিজগড় এবং রুদিয়াসগড় (Kalangjar, Garh Chitra, Garh Nagarwar, Garh Dharwar, Garh Pali, Garh Pipra, Mandar Pahar, Bijnagarh, Hardinagarh, Laknougarh, Nandangarh, Rijgarh, Rudiasgarh)। রুদিয়াসগড় থেকে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বুরুমাঘাট (Burumaghat) অতিক্রম করার পর হাজির হয় ঝাড়খণ্ডের ওমেদান্দায় (Omedanda)।

একটি বাসভূমির আশায় চলতে-ফিরতে থাকা সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস এ চারটি লাইনে সংক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে :

আমাদের জন্মস্থান হিহিরি পিপিরি,
আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে খোজ কামানে,
আমরা বেড়ে উঠেছি হারাতায়,
সাসান বেদায় আমরা হয়ে উঠেছি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী।

আদিবাসীরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার পর, সাঁওতালরা পার্বত্য অঞ্চল যারপি (Jarpi) অঞ্চলে চলে আসে। সেখান থেকে তারা সিন পাস এবং বেই পাসের (Sin Pass, Baih Pass) মধ্য দিয়ে আয়েরে (Aere) প্রবেশ করে। এরপর তারা চলে যায় কায়েন্দে, ছায়ে আর সবশেষে চম্পায় (Kaende, Chae, Champa)। সেখানে তারা দীর্ঘকাল সুখে-শান্তিতে ছিল, তাদের ছিল নিজস্ব রাজা। প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর ছিল নিজস্ব দুর্গ। তারা কারোর অধীন ছিল না। কিস্কুরা ছিল রাজগোষ্ঠী, মুর্মু গোষ্ঠী থেকে পুরোহিত, সরেনরা যোদ্ধা, হেম্ব্রমরা অভিজাত, মান্দিরা ধনী শ্রেণী, টুডুরা ঢোলক ও নর্তক, এবং বাস্করা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এখানে আমরা শহুরে হিন্দু সমাজের একটি হুবহু প্রতিরূপ লক্ষ্য করি (চম্পায় মুণ্ডা, বিরহোর ও কুর্মিদের ন্যায় কতকগুলো দল একটি অভিন্ন নামে পরিচিত ছিল আর তা হল Kharwar)। অসংখ্য সাঁওতাল অভিবাসনের ঘটনা ঘটতে থাকে যে পর্যন্ত না তারা সির, সিখার এবং নাগপুরে (Sir, Sikhar, Nagpur) ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই তারা ছিল মূলত: dekos বা অনাদিবাসী মানুষদের অধীনে। পরবর্তীতে, সাঁওতালরা চলে আসে টুণ্ডি আর পরে সাঁওতাল পরগণায়।

মধ্য অঞ্চলের অপর একটি প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায় হচ্ছে ওঁরাও। তাদের ঐতিহ্য অনুসারে, এক সময় তাদের বাসস্থান ছিল আজবগড় (Ajabgarh)। সেখান থেকে তারা চলে আসে রোতাসগড়ে (Rohtassgarh)। এ সময়টা ছিল তাদের স্বর্ণযুগ...। তাদের সম্পর্কে মুণ্ডা, খাড়িয়া, ওঁরাও, খারওয়া, খেরো ও সাঁওতাল (Mundas, Kharias, Oraons, Kharwars, Cheros, Santal) ঐতিহ্যে বলা হয়েছে যে, একদা ঝাড়খণ্ডে বসবাস শুরু করার আগে তারা বাস করত রোতাসগড় অঞ্চলে। রোতাসগড় ছিল একটি গহীন বনাঞ্চল। এ কারণে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী আর সেই সাথে হিন্দু ও মুসলমানরা ছোটনাগপুর মালভূমির দখলি নিতে চেয়েছিল, যেখানে আগে থেকেই বেশ কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে আসছিল।

জাতি ও ভাষাগত বিভিন্ন গোষ্ঠী

ভারতের আদিবাসীরা মূলত: চার নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর : (১) নিগ্রেটো (গ্রেট আন্দামানি, অংগে এবং জারাবা), (২) প্রোটো অস্ট্রোলয়েড (মুণ্ডা, ওঁরাও ও গন্দ), (৩) মঙ্গোলয়েড (উত্তর-পূর্বের আদিবাসীরা) এবং (৪) ক্যাউকাসয়েড (টোডা, রাবারি এবং গিজ্জার)।

ভাষাগত দিক দিয়ে, ভারতীয় আদিবাসীদের চারটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়।

(১) অস্ট্রেয়-এশীয় পরিবার। এ পরিবারে রয়েছে দু'টি শাখা এবং ৩০টি ভাষা : মন-খামের শাখা যাদের ভাষা হচ্ছে খাসি ও নিকোবারি এবং মুন্ডা শাখা যাদের ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি, খেরবারি, মুন্ডারি, হো, গন্দি, খাড়িয়া, সাভারা, গন্দ, গাদাবা, এবং আরও কিছু ভাষা।

(২) তিব্বত-চীন পরিবার। এ পরিবার ১৪৩টি ভাষার অধিকারী। উত্তর-পূর্ব আদিবাসীরা বেশীর ভাগ যে ভাষাগুলো ব্যবহার করে সেগুলো এই পরিবারেরই ভাষা, যেমন খাম্পতি, ভুটিয়া, লাহাউলি, লেপচা, মিরি, অংগামি, মণিপুরি, থাডো, নাগা (Khampti, Bhutia, Lahauli, Swangli, Lepcha, Miri, Angami, Manipuri, Thado, Naga) ইত্যাদি।

(৩) দ্রাবিড় পরিবার। এ পরিবারে রয়েছে ১০৭টি

ভাষা। এ সকল ভাষার কয়েকটি হল : টোডো, ওঁরাও, মালের, কুই, খন্দ, গন্দি (Korawa, Yerukula, Todo, Oraon, Maler, Kui, Khond, Gondi) ইত্যাদি।

(৪) ইন্দো-আর্য পরিবার। ১৬৩টি ভাষা, যেমন হাজং ও ভিলি।

তবে কে.এস. সিংহের মতে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে পাঁচটি প্রধান ভাষাভাষি পরিবারে বিভক্ত করা উচিত : (১) ইন্দো-আর্য পরিবার (১৯১টি ভাষা), দ্রাবিড় পরিবার (১২৩টি ভাষা), (৩) তিব্বত-বার্মা পরিবার (১৪৬টি ভাষা), (৪) অস্ট্রো-এশীয় পরিবার (৩০টি ভাষা) এবং (৫) আন্দামানি পরিবার (৪)। বাস্তবে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তারলাভের কারণে, দুই বা ততোধিক ভাষায় কথা বলা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রচলিত। অনেক রাজ্যে, তফসিলি উপজাতিদের বিরাট একটা অংশ দ্বিভাষী।

ভারতে আদিবাসী জনসংখ্যার বৃদ্ধি

তফসিলি উপজাতির মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২২.৫১ মিলিয়ন থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮.০৬ মিলিয়নে এবং ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭.৭৬ মিলিয়নে। মিলিয়ন হিসেবে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভিত্তিক তফসিলি উপজাতি জনসংখ্যা ছিল এরূপ : অন্ধ্রপ্রদেশ ৪.২, অরুনাচল প্রদেশ ০.৫৫, আসাম ২.৮৭, বিহার ৬.৬, গুজরাট ৬.২, হিমাচল প্রদেশ ০.২২, কর্ণাটক ১.৯, কেরালা ০.৩, মধ্যপ্রদেশ ১৫.৪, এমএস ৭.৩, মনিপুর ০.৬৩, মেঘালয় ৫.৫, সিকিম ০.০৯, তামিলনাড়ু০.৫৭, ত্রিপুরা ০.৮৫, উত্তরপ্রদেশ ০.২৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ ৩.৮। ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলগুলোতে এটা এ রকম : আন্দামান ও নিকোবার ০.০৩, দাদরা ও নগর হাবেলি ০.১, দামান ও দিউ ০.০১, লাক্ষাদ্বীপ ০.০৫। ঐ সকল রাজ্যের ও ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যায় তফসিলি উপজাতিদের হার সর্বোচ্চ ছিল মিজোরামে (৯৪.৭), এরপর লাক্ষাদ্বীপ (৯৩.৮), মেঘালয় (৮৫.৫) এবং দাদরা ও নগর হাভেলী (৭৯)। সবচেয়ে নিম্নহার ছিল উত্তরপ্রদেশে (০.২), পরে কেরালা (১.১) এবং তামিলনাড় (১.০)। ১৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে, তফসিলি উপজাতিদের জনসংখ্যার সর্বোচ্চ হার মধ্যপ্রদেশে (২৩.৩), এর পর উড়িষ্যা (২২.২), গুজরাট (১৪.৯), এবং রাজস্থান (১২.৪)।

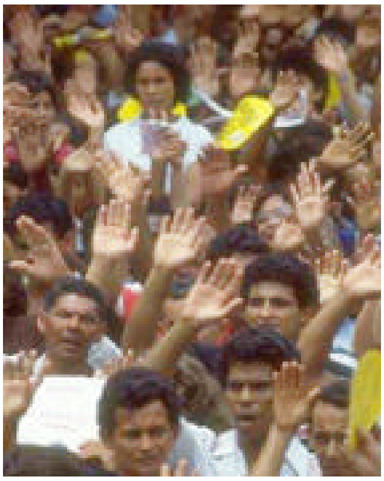

প্রয়োজন পরিবর্তন

এ পর্যন্ত বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর উপর আলোকপাত করা হল। আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী ভারতেরই অপরিহার্য অংশ। তদ্‌সত্ত্বেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের, এ সকল আদিবাসী প্রতিবেশীদের এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিবেকহীন মনোভাবের কারণে, আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর অবস্থা অবশিষ্ট জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের ধুয়ো তুলে সরকারি নীতিমালা ও কার্যক্রমের কারণে আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী তাদের পরিচয়, তাদের মৌলিক মানব মর্যাদা, তাদের আদিপুরুষের বাসভূমি এবং জীবিকার উৎসগুলো হারাতে বসেছে।

আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যতই ব্যয় করা হোক না কেন, এটা তাদের কোন সাহায্যেই আসবে না, যদি সামাজিক প্রকৌশল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক শাসনের দমনমূলক ও নীতিবিরুদ্ধ নীতিমালার আমূল রূপান্তর ঘটানো না হয়, যেগুলো আসলে বর্ণ-মনস্ক উচ্চ শ্রেণীর শাসক অভিজাতদেরই সৃষ্টি। পৃথিবীবাসী ও ভারতীয় জনগণের মনে রাখা দরকার যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 'সভ্যতা' এসেছে ও গিয়েছে, তার সবই আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠীর বাসভূমিতে গড়ে ওঠা।